জরাসন্ধের লৌহকপাট : ব্যতিক্রমী সাহিত্য

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকে বাংলা উপন্যাসের জগতে জরাসন্ধ ছদ্মনামে চারুচন্দ্র চক্রবর্তী একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। ঔপন্যাসিক জরাসন্ধের নামের উল্লেখ করা হলেই তাঁর চার পর্বে লিখিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় 'লৌহকপাট' (১ম পর্ব—১৯৫২ চৈত্র ১৩৬০, ২য় পর্ব—১৯৫৪ অগ্রহায়ণ ১৩৬২, ৩য় পর্ব—১৯৫৮ ভাদ্র ১৩৬৫, ৪র্থ পর্ব—১৯৬৪ চৈত্র ১৩৭১) উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। লেখক স্বয়ং ছিলেন কারাগারের অধ্যক্ষ—প্রথমে ডেপুটি জেলর, পরে জেলর, আরও পরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় জেলের কর্মী ও কয়েদি উভয় পক্ষকেই তিনি কাছ থেকে দেখেছিলেন; দেখেছিলেন মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। নিকট সান্নিধ্যের ফলে এই মানুষগুলির জীবনের যেসব গল্প তিনি আহরণ করেছিলেন, সেগুলিকেই লেখক 'লৌহকপাট' উপন্যাসে সহমর্মী ভাষায় তুলে ধরেছিলেন পাঠকের কাছে। 'লৌহকপাট' ছাড়াও তাঁর 'ন্যায়দণ্ড' (১৯৫৮), 'তামসী' (১৯৫৮) উপন্যাসেও কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে।

জরাসন্ধের জীবনপঞ্জি অনুসরণে দেখা যায়, চারুচন্দ্র প্রথমে দার্জিলিং জেলে (১৯৩০) কর্মরত ছিলেন। তারপরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, প্রেসিডেন্সি, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কারাগারেই তিনি চাকরি করেছেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন মেদিনীপুর জেল থেকে কৃষ্ণনগর জেলে বদলি হয়ে আসেন তখনই তিনি জেল নিয়ে লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা সেই খাতাটি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ একবার হাতে পেয়ে হাত ছাড়া করেননি।[১] তিনি বুঝেছিলেন কারাজীবনের এমন মনোজ্ঞ রচনা হতঃপূর্বে পাওয়া যায়নি। সম্পাদক তাই লেখাটি ছাপাতে চাইলেন। লেখক অনাগ্রহী হলেও পরে 'জরাসন্ধ' ছদ্মনাম নিয়ে 'লৌহকপাট' প্রথম পর্ব ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল। লেখক কারাজীবন সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলেছেন, "এইটুকু শুধু বলতে পারি, জীবনের এমন একটা পথে আমাকে চলতে হয়েছে, যেটা প্রকাশ্য রাজপথ নয়। সে এক নিষিদ্ধ জগৎ। সেখানে যাদের বাস, তাদের ও আমাদের এই দৃশ্যমান জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লৌহদণ্ডের যবনিকা। তার ওপারে পাষাণঘেরা রহস্যলোক। কিন্তু তারাও মানুষ। তাদেরও আছে বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী—সুখে সমুজ্জ্বল, দুঃখে পরিম্লান, প্রেমে জ্যোতির্ময়। সেই পাষাণপুরীর দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের স্তব্ধ বাতাসে জমে আছে যে অলিখিত ইতিহাস সভ্য পৃথিবী তার কতটুকুই বা জানে?"[২]

'লৌহকপাট' প্রথম পর্ব 'দেশ'-এ প্রকাশিত হওয়ার পরেই ১৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে চারুচন্দ্র দমদম সেন্ট্রাল জেলে বদলি হয়ে যান। এরমধ্যেই তিনি 'লৌহকপাট'-র দ্বিতীয় পর্ব লিখে ফেলেন। এরপর তিনি আবার ১৯৫৫-৫৮ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি হয়ে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকসজনীকান্ত দাস তাঁকে 'লৌহকপাট'-এর তৃতীয় পর্ব লিখতে অনুরোধ করেন। তখন জরাসন্ধ জানিয়েছিলেন, "কিন্তু লৌহকপাটের দুটি দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে। দয়া করে খুলতে আর বলবেন না।"[৩] সজনীকান্ত দাস এর জবাব দিয়েছিলেন, "লৌহকপাটের

ভিতরে অনেক কপাট আছে। আমি স্বয়ং সজনীকান্ত এসেছি সেইসব কপাটগুলো খুলে দিতে। এই অন্ধকার জগতের 'অমানুষ' নামধারী লোকগুলোকে 'মানুষ' করে আপনি জনসমাজে তুলে ধরেছেন। এ কৃতিত্ব আপনার কম নয়।"[৪] চারুচন্দ্র তখন বাধ্য হয়ে 'লৌহকপাট'-এর তৃতীয় পর্ব লিখলেন। 'লৌহকপাট'-এর চতুর্থ পর্ব লিখেছিলেন 'উল্টোরথ' পত্রিকার পক্ষ থেকে গিরীন্দ্র সিংহ এবং প্রসাদ সিংহের অনুরোধে।

'লৌহকপাট' উপন্যাসে কারাজীবনের চিত্র নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এই উপন্যাসে কারারুদ্ধ শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের জীবনটাই মূল অবলম্বন হয়ে উঠেছে। তবে সমাজে যারা অপরাধী বলে চিহ্নিত বা অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত (খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি) তাদের সঙ্গে তথাকথিত নিরপরাধীদের সম্পর্কের বিশ্লেষণটাই 'লৌহকপাট' উপন্যাসের মূল বিশেষত্ব। সেইসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজন, লিঙ্গবৈষম্য, অপরাধমনস্কতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। যেমন 'লৌহকপাট' উপন্যাসের প্রথম পর্ব থেকে একটি কথাবৃত্ত বিবৃত করছি। রহিম শেখকে চুরির অপরাধে একাধিকবার কারাবাস করতে হয়। সে একবার জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ডেপুটি জেলর মলয় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর গৃহে নতুন রকমের চেয়ার প্রস্তুত করে দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি তা উপেক্ষা করে তাকে একটি ভালো কর্মে নিযুক্ত করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু রহিম শেখ বলে যে জেল ফেরৎ আসামিকে এইভাবে অন্য কোথাও কাজে ঢোকালে যখন সত্য প্রকাশ পায় তখন চাকরিও চলে যায় এবং সহানুভূতিশীল কারাধ্যক্ষেরও শাস্তি হয়। এমনই তার আগের অভিজ্ঞতা। পরে রহিম শেখ পকেটমারদের দলের সর্দার হয়েছিল এবং মলয় চৌধুরীর চুরি যাওয়া মানিব্যাগ উদ্ধার করে দিয়েছিল।

এই কথাবৃত্তটিতে দুটি সমাজ-সত্য উঠে আসে। *প্রথমত*, তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষেরা নিম্নবর্গের কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদিকে কখনই বিশ্বাস করে কোনো চাকরি দেবে না। এ হলো সামাজিক শ্রেণিগত অবিশ্বাসের প্রমাণ। *দ্বিতীয়ত* সহানুভূতির স্পর্শ পেলে জেলের কয়েদিও কারাধ্যক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

'লৌহকপাট'-এর দ্বিতীয় পর্বের একটি কাহিনিতে আছে এক কয়েদির সঙ্গে কারাধ্যক্ষের বালিকা কন্যার স্নেহের সম্পর্কের বিবরণ। আসামি রতিকান্ত জেলর-এর কন্যা মঞ্জুর দেখাশোনা করতো। মুক্তি পাবার সময় সে মঞ্জুর একটি পুতুল নিজের মেয়ের জন্য চুরি করে। ধরা পড়বার পর যখন তাকে প্রহার করা হচ্ছে, তখন মঞ্জু সেখানে এসে রতিকান্তকে বলে, 'টুনিকে দিও। বলো মঞ্জু দিয়েছে! অ্যাঁ?"[৫]

এই কথাবৃত্তটিতে দেখেছি রতিকান্তর জেল হয়েছিল ঘড়ি চুরি করার অপরাধে। কিন্তু সে ঘড়ি চুরি করেছিল, কারণ মনিব তাকে মাইনে দেয় নি। রতিকান্ত পেয়েছে চুরির শাস্তি। কিন্তু গরিব মানুষটিকে বঞ্চিত করার অপরাধে তার মনিবের কোনো শাস্তি হয়নি। তারপরেই ঘটে পুতুল চুরির ঘটনা।

সমাজবীক্ষণের দিক থেকে এখানেও আমরা মালিক ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় বোধের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড লক্ষ করি। যে কারণে মনিবের শাস্তি হয়নি; কিন্তু কর্মচারীর হয়েছে। রতিকান্তর মধ্যে লেখক ছোটোখাটো অপরাধের দিকটি অস্বীকার করেননি। তবে পুতুল চুরির ক্ষেত্রে তার চৌর্যবৃত্তি নয়; পিতৃস্নেহই বড়ো হয়ে উঠেছিল।

মুক্তি পাবার পর পুতুল সরিয়ে আনতে গিয়ে রতিকান্ত ধরা পড়ে এবং মার খায়। তখন বালিকা মঞ্জু ঘোষণা করে যে তার মেয়ের জন্যই সে পুতুলটি দিয়েছে। এই ঘটনাটি শিশু মনস্তত্ত্বের চমৎকার অভিব্যক্তি।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের 'ওরা' ও 'আমরা'—এই বিভাজনে মঞ্জুর শিশুমন অভ্যস্ত নয় বলেই রতিকান্তর সঙ্গে সে অত্যন্ত আপনজনের মতো মিশেছে। এখান থেকে বোঝা যায় মানুষ জন্ম থেকেই সামাজিক শ্রেণিবিভাজনের বোধ অর্জন করে না। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গড়ে তোলা সমাজেই আছে এই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শ্রেণিবিভাজন। সমাজসমীক্ষণের এই দিকটি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই কথাবৃত্তে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচার ও নারীদের উপর আধিপত্য প্রদর্শনের প্রবণতা আমরা 'লৌহকপাট'-এর তৃতীয় পর্বের একটি কথাবৃত্তে পাই। সেখানে অপর্ণার মায়ের জীবনে তার পিতা অমানবিক অত্যাচার করে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে পারিবারিক মনস্তত্ত্বের জটিলতা অপর্ণার মতো অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাই সে পরবর্তীকালে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে পারেনি। অপর্ণার এই পরিণতির জন্য দায়ী কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর রূপটি বারে বারেই বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে 'লৌহ কপাট' উপন্যাসের কথাবৃত্তে। যেমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি ব্যাধিই হলো বিকৃত যৌনতা। 'লৌহকপাট'-এর তৃতীয় পর্বের আরও একটি নারী চরিত্র জ্ঞানদার শরীরকে ভোগ করতে মুদির পুত্র যে অত্যাচার তার উপর চালিয়েছিল তা বিকৃত যৌনতারই নামান্তর। আবার যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারীকে হত্যা করতেও যে পুরুষেরা পশ্চাৎপদ হতো না তার পরিচয় 'লৌহকপাট'-এর চতুর্থ পর্বের কাদের মোল্লার জীবনকাহিনিতে পাই। সেও তার জামাইবাবু তোফাজ্জলের অপমানের প্রতিশোধ নিতে নিজের মা-কে খুন করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বেচ্ছাচারিতাকে বজায় রেখেছে।

'লৌহকপাট' উপন্যাসটি বস্তুতপক্ষে একটি গল্প সংকলনের মতোই। সহ-কারাধ্যক্ষের অভিজ্ঞতার সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন জেল কয়েদির বিভিন্ন জীবন অভিজ্ঞতা শ্রুত কাহিনির আকারে বিবৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মন্তব্য করেছেন, "লৌহকপাট ঠিক উপন্যাস নহে, অনেকগুলি উপন্যাসধর্মী খণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনির সমষ্টি।"[৬]

তবে উপন্যাসটিতে লেখক কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দিদের বিভিন্ন অনুভূতির কথাই শুধু বলেন নি; সেই সঙ্গে জেলের নানান খুঁটিনাটি দিক যেমন নারী কয়েদিদের জীবন, আহার, পোশাক, স্নান, হাজতের রন্ধনশালা ইত্যাদি বিষয় যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুটিত। জরাসন্ধ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কয়েদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ এবং আচরণীয় নিয়মকে বর্ণনার গুণে সজীব চরিত্র করে তুলেছেন। কারাজীবনে কেউ হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে তাকে খাদ্যগ্রহণ করানোর যে কৌশলটি লেখক উপন্যাসটিতে পরিবেশন করেছেন তা কারাব্যবস্থার একটি অভিনব চিত্র তুলে ধরে, "...একটা বড় জগে করে ফানেলের মধ্যে মিশ্র রসায়ন ঢালা হচ্ছে, আর দুটো নল বেয়ে সেটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে উন্নত নাসারন্ধ্রে। এক একটা জগ শেষ হয় আর চেঁচিয়ে ওঠে আফজল 'আউর দেও'। জগ ভরতে যে-টুকু দেরি তার মধ্যে আবার হুঙ্কার দেয় 'আউর দেও'

এমন করে গোটা বালতিটা নিঃশেষ হয়ে গেল।"[৭]—এগুলি জেল জীবনের ভিতরকার দমনপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার চিত্র।

এইভাবে 'লৌহকপাট' উপন্যাসে কারাজীবনের যে চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন তাতে জেলের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কারাবন্দিদের মনস্তত্ত্ব ও সমাজজীবনের রূঢ় বাস্তব সত্য একসঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, "...এ যেন সাহিত্য-রাজ্যে জেলকোডের প্রয়োগ।...সরকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থা, জেলের কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা ও দরদী মানুষের সহানুভূতি এবং তাহারই আলোকে সত্য আবিষ্কারের শক্তির পার্থক্য লৌহকপাটের কাহিনিগুলির মধ্যে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[৮]

'লৌহকপাট' উপন্যাসের সমীক্ষায় যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উঠে আসে সেগুলি হল : এক. উপন্যাসটির কাহিনি ভাবাবেগপ্রবণ (সেন্টিমেন্টাল)। উপন্যাসটিতে কারাধ্যক্ষের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে অপরাধীদের। সেখানে কারাধ্যক্ষ সন্ধান করেছেন অপরাধীর ছাপের আড়ালে আছে মানবিক মুখ। দুই. অপরাধীদের মনস্তত্ত্বের পরিচয় খুব সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। যেমন কেউ অভাবের তাড়নায় চুরি করে, কেউ তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বশে অপরাধ করে, আবার কেউবা স্বভাবগত অপরাধী। মানুষের মনের কত বিকার, কত অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, কত চমকপদ অসঙ্গতি, কত পাকানো জট ও লুকানো ক্ষত আছে। সেগুলি 'লৌহকপাট' উপন্যাসের কারাধ্যক্ষ মলয় চৌধুরী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তাদের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেছেন।

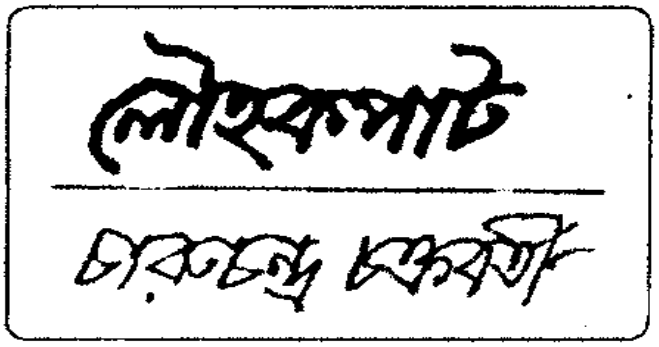

সুতরাং 'লৌহকপাট' উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার মূল কারণগুলি হল *প্রথমত*, জরাসন্ধ ব্রাত্য সমাজজীবনকে অর্থাৎ আইনের চোখে অপরাধী যারা সেই সমস্ত সমাজের মানুষকে এই উপন্যাসের পাতায় তুলে এনে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চারুচন্দ্র নিজে কারাগারে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হওয়ায় বহু আইনলঙ্ঘনকারী শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদিকেই কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই সমস্ত কয়েদিরা সামাজিক পরিস্থিতির চাপে আইন লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করলেও মানবিকতার বিচারে তারা অনেকেই অপরাধী নয়। তাদের অপরাধ আসলে সমাজের বৈষম্যজনিত পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সেজন্যই লেখক হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন অপরাধীদের সাধারণ মানুষরূপে সহমর্মিতার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে। এই কারণেই তাঁর উপন্যাসটি হয়েছে অতীব জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য। *দ্বিতীয়ত*, জরাসন্ধ চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকের জন্য সরলভাবে একটি আখ্যান বয়ন করতে। 'লৌহকপাট'-এর ভাষা যাতে সেই মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে সহজবোধ্য ও প্রসাদমণ্ডিত বলে মনে হয় সেই দিকেই দৃষ্টি ছিল তাঁর। *তৃতীয়ত*, লেখকের জীবিতকালেই 'লৌহকপাট' উপন্যাসের অনেকগুলি সংস্করণ ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'লৌহকপাট'-এর চলচ্চিত্র হয়েছিল। পরিচালক তপন সিংহ উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়নে ব্রতী হয়েছিলেন। *চতুর্থত*, ইতঃপূর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫), গোপাল হালদারের 'অন্যদিন' (১৯৫০), 'আর একদিন' (১৯৫১), অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি. কেলাস' (১৯৪৮) প্রভৃতির মতো বাংলা সাহিত্যে কারাজীবন নিয়ে একাধিক উপন্যাস লেখা হলেও জরাসন্ধের 'লৌহকপাট'

কিন্তু অন্য উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ক্বচিৎ স্বদেশী বন্দিদের প্রসঙ্গ এলেও জরাসন্ধের লেখায় রাজনীতির ছাপ নেই। সেখানে কয়েদিরা যেন কোনো শ্রেণি নয়; প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যক্তি পরিচয় নিয়েই উদ্ভাসিত। তারা প্রত্যেকেই সামাজিক অপরাধী। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষ। একজন সমালোচকের ভাষায়, ''লৌহকপাট'-এ যে জীবনের স্বাদ, তা কথাসাহিত্যে নতুন। জেলবন্দী বদরুদ্দীন মুন্সীর আত্মযন্ত্রণার মানবিক মহনীয়তা ও ফাঁসিকাঠে যাওয়ার আগেই আত্মমর্যাদা রক্ষায় আত্মহনন, কাশেম ফকির ও তার স্ত্রী কুটিবিবির যৌথ অপরাধ প্রয়াস এবং শেষে স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির কারণে স্বামীকে ফাঁসির মঞ্চে পাঠানো, এক পাগলিনী জেলবন্দী মল্লিকার স্নেহার্ত হৃদয়নিহিত ভাগ্য বিড়ম্বনার সকরুণ মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়, স্বদেশী কয়েদীদের প্রতি জেল সুপার রামজীবনবাবুর সহমর্মী দেশাত্মবোধের মনোভাবে স্বদেশী করা কয়েদীকে মুক্তিদান, নবদ্বীপের ব্রহ্মচারী সদানন্দের হাজতবাস কথা, জেলের মধ্যে জ্ঞানদার আত্মনিগ্রহ ও আত্মশুদ্ধির রূপ—এই সব খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনা করে জরাসন্ধ 'লৌহকপাট'-এ এক নতুন জগতের বিচিত্র জীবন পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন।''[৯] এখানে লক্ষ করার যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সব জাতীয় মানুষই তাঁর এই কাহিনিগুলিতে ভীড় করেছে। কোনোরকম সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে চরিত্রগুলোকে আবদ্ধ না করে সর্বকালের ও সর্বদেশের মানুষ হিসেবে লেখক দেখেছেন। লেখকের এই উদার মানবতাবোধই 'লৌহকপাট' উপন্যাসকে আজকেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১। উৎস : জরাসন্ধের কনিষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত রঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পি-৬৩৯, 'ও' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, বাড়িতে সময় দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা।

২। জরাসন্ধ : জরাসন্ধ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), 'লৌহকপাট' প্রথম পর্ব, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, অবতরণিকা, পৃ. ৫।

৩। জরাসন্ধ : জরাসন্ধের বহরমপুরের বাসস্থলে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে কথোপকথন (১৯৫৭), উদ্ধৃত রণজিৎ চক্রবর্তী সম্পর্কিত 'মরমী কথাশিল্পী জরাসন্ধ' গ্রন্থে, পৃ. ১৬।

৪। (৩)—তদেব, পৃ. ১৬।

৫। জরাসন্ধ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), 'লৌহকপাট' দ্বিতীয় পর্ব, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৬, পৃ. ৩৬।

৬। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', প্রবন্ধ : কারাসাহিত্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, ১ম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ. ২৭৪।

৭। (৫)—তদেব, পৃ. ৯৬।

৮। (৬)—তদেব, পৃ. ২৭৪।

৯। বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলা কথাসাহিত্যের একাল' (১৯৪৫—'৯৮), পুস্তক বিপণি, পৃ. ১১৫।